মানিক ও কল্লোল

তপোবিজয় ঘোষ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কল্লোল' অথবা তার সহযোগী 'কালিকলম' পত্রিকায় কখনো কোনো লেখা প্রকাশ করেননি। তাঁর প্রথম লেখা ছোটগল্প 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৬০) সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯২৮ সালে (১৩৩৫, পৌষ সংখ্যা)। কল্লোল ও বিচিত্রা উভয়েই মাসিক পত্রিকা ছিল। দীনেশরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় কল্লোল প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে, বাংলা ১৩৩০, বৈশাখ মাসে। পত্রিকাটি সাত বছরের মত বেঁচে ছিল। এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সনের পৌষ মাসে। মানিক 'অতসীমামী' লেখার পর ইচ্ছা করলে কল্লোলের প্রকাশিত পরবর্তী ১২টি সংখ্যার কোনো একটিতে অন্তত একটি গল্পও লিখতে পারতেন। অন্যদিকে মুরলীধর বসুর সম্পাদনায় 'কালিকলম' (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৩৩) পত্রিকা তখন যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছে।[১] মানিক এ কাগজেও গল্প দিতে পারতেন।

অন্যদিকে মানিক কল্লোল-কালিকলমের আড্ডারও কখনো অন্তর্ভুক্ত হননি—যদিও ঐ পত্রিকাদুটির লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই ছিলেন তাঁর সমবয়সী। বুদ্ধদেব বসু ও মানিকের জন্ম একই বছরে—১৯০৮ সালে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমারের জন্ম যথাক্রমে ১৯০৪ ও ১৯০৩ সালে। 'অতসীমামী' রচনার পূর্বে এঁদের কারো সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও হয়নি। অচিন্ত্যকুমার তাঁকে প্রথম দেখেন 'বিচিত্রা' অফিসে।[২] তিনি তখন ঐ পত্রিকায় চাকরি নিয়েছিলেন—'আসলে প্রুফ দেখার কাজ, নামে সাব-এডিটর, মাইনে পঞ্চাশ টাকা।'

সে-সময় মানিক একদিন এসে উপস্থিত। তাঁর প্রথম আবির্ভাবের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার তাঁর সুবিখ্যাত 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে—

"একদিন দুপুরবেলা বসে আছি—বা, বলতে পারি কাজ করছি—একটি দীর্ঘকায় ছেলে ঢুকল বিচিত্রা আপিসে। দোতলায় সম্পাদকের ঘরে। উপেনবাবু তখনো আসেননি। আমি উপনেতা।

'একটা গল্প এনেছি বিচিত্রার জন্যে'—হাতে একটি লেখা, ছেলেটি হাত বাড়াল। প্রখর একটি ক্ষিপ্রতা তার চোখে মুখে, যেন বুদ্ধির সন্দীপ্তি। গল্প যেন এখুনি শেষ করেছে আর যদি কালবিলম্ব না করে এখুনি ছেপে দেওয়া হয় তা হলেই যেন ভাল।

'এই রইল—'

ভঙ্গিতে এতটুকু কুণ্ঠা বা কাকুতি নেই। মনোনীতি হবে কি না হবে সে সম্বন্ধে এতটুকু দ্বন্দ্ব নেই। আবার কবে আসবে ফলাফল জানতে, কৌতূহল নেই একরত্তি। যেন, এলুম, দেখলুম, আর জয় করলুম—এমনি একটা দিব্য ভাব।"

বলাবাহুল্য এই গল্পই 'অতসীমামী'।

কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের স্মৃতিচর্চা যদি ওই পর্যন্তই থাকত তা হলে এ প্রবন্ধ লেখার দরকার হত না। তিনি যথেষ্ট আবেগ ও অনুরাগের সঙ্গেই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে অভ্যর্থিত করেছেন এই রচনায়। স্বল্পতম রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ বছরের সদ্যোযৌবনপ্রাপ্ত মানিকের একরোখা দৃঢ় চরিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু এরপরেই অচিন্ত্যকুমার মানিকের দখলি-স্বত্ব দাবি করেছেন, বিচিত্রার নয়, কল্লোলের পক্ষ থেকে—

"মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে 'কল্লোল' ডিঙিয়ে 'বিচিত্রা'য় চলে এসেছে। পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়। আসলে সে 'কল্লোলে'রই কুলবর্ধন। তবে দুটো রাস্তা এগিয়ে এসেছে বলে সে আরো ত্বরান্বিত। কল্লোলের দলের কারু কারু উপন্যাসে পুলিশ যখন অশ্লীলতার অজুহাতে হস্তক্ষেপ করে, তখন মানিক বোধহয় শুক্তিমগ্ন। এক যুগে যা অশ্লীল, পরবর্তী যুগে তাই জোলো, সম্পূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক।"

'কল্লোলযুগ' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ সালে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৫০ এ। মানিক তখন কমিউনিস্টপর্বের লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কল্লোল উঠে যাওয়ার ২০ বছর পরে অচিন্ত্যকুমারের স্মৃতিচারনায় মানিকের প্রথম পর্বের লেখাগুলোর দিকেই মাত্র এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যে ক'টি বাক্য উপরে তোলা হয়েছে, তার অতিরিক্ত একটিও শব্দ মানিকের সাহিত্য সম্পর্কে তিনি কল্লোলযুগ গ্রন্থে ব্যবহার করেননি। যেন মানিকের অন্য কোনো অস্তিত্ব তাঁর কাছে স্বীকার্যই নয়।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়—মানিকের কুলবর্ধনত্ব দাবি করার পরেই অচিন্ত্যকুমার ঝাঁপ দিয়েছেন যৌনাশ্রয়ী অশ্লীলতার প্রসঙ্গে। পুলিশী প্রসঙ্গের পর 'শুক্তিমগ্ন' শব্দটি অসাধারণ নৈপুণ্য ও তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যবহার করে তিনি এটাই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-তত্ত্বের আশ্রয়ে নরনারীর অবদমিত কামপ্রবৃত্তি উদ্‌ঘাটনের যে সরল ও জৈবিক পথ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন কালধর্মে যখন ক্রমশ তা 'জোলো' ও 'হতাশাব্যঞ্জক' হয়ে ওঠার মুখে এবং নতুনতর শক্তিমান লেখকের জন্য অপেক্ষমান—ঠিক তখুনি ঝিনুকের খোলা ভেঙ্গে মানিকের আবির্ভাব সূচিত হয়েছে। মানিক সেই ধারাতেই বেগবান প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোলযুগ' রচনার কালে ভালভাবেই জানতেন যে, কমিউনিস্ট-পর্বের মানিক কোনো অর্থেই 'কল্লোলের কুলবর্ধন' হতে পারেন না। তাই তিনি মানিককে বাঁধতে চেয়েছেন তাঁর আদি-পর্বের রচনার ভিত্তিতে যৌনধর্মী-মনস্তাত্ত্বিকতার সূত্রে-শৃঙ্খলে। অন্যথা মানিক-প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে কল্লোলীয় উপন্যাসে অশ্লীলতা, পুলিশী হস্তক্ষেপ, ঠিক সেই সময় মানিকের শুক্তিমগ্ন থাকা ইত্যাকার পদ-বিনাসের সার্থকতা কি!

কিন্তু অচিন্ত্যকুমার নতুন কথা কিছু বলেননি। তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশিত হওয়ার বছর দুই আগে প্রকাশিত, বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত An Acre of Grass (প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৮) গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ভুক্ত 'Modern Bengali Prose' প্রবন্ধে বুদ্ধদেবই প্রথম মানিককে বলেন—'belated kallolean' এবং পাদটীকায় এর ব্যাখ্যা করেন—'Though of Kallol in spirit, very much so, his work, by some strange chance, never

nppeared in its pages, and he caught up with Kalloleans only after Kollol had stopped।'

অচিন্ত্যকুমার মানিকের লেখার কোনো মূল্যায়ন করেননি। উল্লিখিত প্রবন্ধে বুদ্ধদেব করেছেন। কিন্তু সে মূল্যায়নও মানিকের প্রথম পর্বের কয়েকটি রচনাকে আশ্রয় করেই। স্মরণযোগ্য যে, ১৯৪৮ সালের মধ্যে মানিকের গ্রন্থগ্রন্থ ভেজাল (১৯৪৪), হলুদপোড়া (১৯৪৫), পরিস্থিতি এবং আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬) প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে দর্পণ (১৯৪৪), সহরবাসের ইতিকথা, চিন্তামণি (১৯৪৬), চিহ্ন এবং আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭) বের হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের দৃষ্টিপাতও সেই পুরনো-হয়ে-যাওয়া ১৯৩০ থেকে '৪০-এর মধ্যবর্তী মানিকের দিকেই।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধের মানিক-অংশের সূত্রপাতে তিনি অকৃপণভাবেই মানিকের প্রশংসা করেছেন—এত প্রশংসা সম্ভবত মানিকের মৃত্যুর পরে লেখা বাংলা নিবন্ধটিতেও করেননি। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে। আসলে ১৯৪৮ সালে বুদ্ধদেব বসুর মানসিকতায় প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বের কিছু মূল্যবোধ ও মমত্ববোধ কাজ করছিল। কেননা সাহিত্যদর্শনগত ভিন্নতা সত্ত্বেও একসময় তিনি যুক্ত ছিলেন 'প্রগতি লেখক সংঘ' (১৯৩৬) এবং 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘ' (১৯৪২)-এর সাথে।[৪] ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলন ও মঞ্চে তাঁর যাতায়াত ছিল মানিকের সহযোগী রূপে। কিংবা মানিকেরও আগে তিনি এ বিষয়ে প্রখর সচেতনতার সঙ্গে কবিতা লিখেছেন সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের (৮ই মার্চ ১৯৪২) প্রতিবাদে, শিল্পী-সংঘের পক্ষে ফ্যাসিজমের ভয়াবহতা দেখিয়ে প্রচার-পুস্তিকা রচনা করেছেন, কমিউনিস্ট কবি জেনেও ভালবাসার সঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা প্রকাশ করেছেন তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় এবং ১৯৪৭ সালে সুকান্তর মৃত্যুর পর দীর্ঘ শোক-প্রবন্ধও লিখেছেন ওই পত্রিকায়। এসব কারণে অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেবের মধ্যে একটা মাত্রাগত পার্থক্য ঘটেছে—সেটা ভোলার নয়। তাছাড়া বুদ্ধদেব শুধু কবি ছিলেন না, তীক্ষ্ণধী সাহিত্য-সমালোচকও ছিলেন। তাঁর নিজের বৃত্তে তিনি এক মননদীপ্ত বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অসামান্য গদ্য-লেখক।

মানিক সম্পর্কে তিনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিতেই বলেছেন—"Manik Bandyopadhyay with his first four or five volumes convinced us that he was about the most completely equipped writer in fiction we had ever had.

এবং—

"He had both virtuosity and vision, he was both logical and magical, he seemed to be wanting in nothing and we thought that there was none like him, none."

মানিকের প্রথম যুগের চার পাঁচটি উপন্যাস হল—দিবারাত্রির কাব্য, জননী, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, জীবনের জটিলতা। ১৯৩৪ থেকে '৩৬-এর মধ্যে এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর লক্ষ্য প্রধানতঃ ওই উপন্যাস ক'টি এবং

সম্প্রসারিত অর্থে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পগ্রন্থ (১৯৩৭)। অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে মানিকের ঐ-সব লেখার ও লেখকের বিস্তর প্রশংসার পর তিনি বর্তমানকালে এসে উপলব্ধি করেছেন—সেই মানিক আর নেই, সেই প্রতিভা মৃত—'The writer referred to in it does not any longer exist.'

এরপর সেই বিগতশক্তি, বিশীর্ণ ও বিবর্ণ মানিকের জন্য তিনি বেদনাবোধ করেছেন—"The disaster that has overtaken Manik Bandyopadhyay is as unequivocal as that which befell the later Wordsworth. As unequivocal but many times more lamentable, for our novelist has gone down after a few years of fruitful activity, and down, what is more, not merely into dull stagnation, but right into the depths of degeneracy."

কিন্তু মানিকের এই সামুহিক বিনষ্টির জন্য তিনি তাঁর কমিউনিস্ট-রাজনীতিকে দায়ী করেননি। পরবর্তীকালে যেমন করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে।[৫] "রাজনীতির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে তিনি দায়ী করেছেন মানিকের সাম্প্রতিক রচনায় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অক্ষমতাকে, নরনারীর যৌনসম্পর্ক চিত্রণের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটানোর মানসিকতাকে। তিনি বলেছেন—"his more recent work reads like little manuals of sex-psychology or the case-histories of maniacs" এবংএই সব বিচ্যুতি ও অক্ষমতার কারণেই "Manik Bandyopadhyay has lost interest in character, action, psychology ; he observes no longer, alas, various psychological types, but only various types of neuroses ; to him, now, the thesis is the thing, and men and women are no more than indespensable symbols."

অথবা

"My objection is not merely that his episodes are course and brutal in the reading, but more fundamental, thay lack life and humanity ; what he is talking about is sex, not the complex, multiform experience of men and women, but bleak concupiscence surgically evacauted of delight and wonder and even animal warmth."

সব মিলিয়ে বোঝা গেল শিল্পী হিসেবে মানিকের মৃত্যু সম্পূর্ণ হয়েছে। 'রজনী হল উতলা' কিংবা 'বন্দীর বন্দনা'র মহান ঐতিহ্যকে মানিক বহুগুণিত করতে পারেননি। জীবন এবং মানবিকতা উভয় থেকেই তিনি ভ্রষ্ট হয়েছেন। আবার একই সঙ্গে এও স্পষ্ট হল মানিক কোন্ অর্থে 'belated kallolean'!

১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর মানিকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় একটি শোকনিবন্ধ লেখেন। সেটি 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' শিরোনামে তাঁর 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিবন্ধটির রচনাকাল নির্দেশিত আছে '১৯৫৭' এবং গ্রন্থটির প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৫৭। এই নিবন্ধও মানিককে তিনি কল্লোলের বিলম্বিত পরিপক্ক ফল বলে আরো জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন—

"দৈবাৎ, এবং অল্পের জন্য, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখক তিনি হননি, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্থান সেখানেই চিহ্নিত ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ ও 'যুবনাশ্বে'র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট। প্রভেদ এই, তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিল না, কেননা যার জন্য 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ, সে জমি ততদিন জেতা হয়ে গেছে এবং একই কারণে, মণীন্দ্রলাল-গোকুলচন্দ্রের স্কুলেও তাকে হাত পাকাতে হয়নি। তিরিশের যুগে যাঁরা তার প্রথম রচনাবলী পড়েছেন তাদের বুঝতে দেরী হয়নি যে সদ্যমৃত 'কল্লোলে'র সর্বশেষ, বিলম্বিত পরিপক্ক ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।"

কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'যুবনাশ্ব' বা মণীষ ঘটক কয়েকটি মাত্র গল্পচিত্র রচনা করেছিলেন, সেগুলো 'পটলডাঙার পাঁচালী' নামে বই বের হয় ১৯৫৬ সালে। 'পটলডাঙার পাঁচালী' যুবনাশ্বেরই একটি নাট্যধর্মী গল্পচিত্রের নাম। এঁর দু'একটি রচনার যৎসামান্য প্রভাব মানিকের গল্পে আছে।

পটলডাঙার ভিখিরিপাড়ায় খেঁদিপিসীর আস্তানায় নষ্ট মেয়েমানুষ, গলিত কুষ্ঠরোগী, বদ্ধ মাতাল, ছিঁচকে চোর ইত্যাদির ভিড়। এ পরিবেশে নারী বলভোগ্যা ও ধর্ষণযোগ্যা। পুরুষ নির্বিকার, স্বার্থপর ও জান্তব। মানিকের 'প্রাগৈতিহাসিক' জাতীয় গল্পের অস্ফুট পটভূমি। গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) কল্লোলের অন্যতম স্থপতি এবং সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা পথিক (১৯২৫) উপন্যাস। বাংলাসাহিত্যে বাস্তবধর্মী আধুনিকতার প্রবর্তনে উপন্যাসটির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কল্লোলের কল-কোলাহলের মধ্যে ইনি কালিদাস নাগ ও শান্তাদেবীর সঙ্গে একত্রে অনুবাদ করেছিলেন রোঁমা রোলাঁর 'জাঁ ক্রীসতফ্' উপন্যাস এবং তা কল্লোলেই ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ কথা অযথার্থ নয় যে, দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র—দু'জনে মিলে কল্লোলকে কেন্দ্র করে নব-বাস্তবতার একটা 'স্কুল' তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে মণীন্দ্রলাল বসুর নাম বুদ্ধদেব কেন করেছেন তাও একটু পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। মণীন্দ্রলাল (১৮৯৭) [*১৯৮৯ সালে এই প্রবন্ধ লেখার সময়ে মণীন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন ঃ সম্পাদক*] কল্লোল-কালিকলমের অন্যতম উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁর 'রমলা' (১৯২৩) উপন্যাসের রোমান্টিক বাস্তবতা ও ছোট গল্পগুলির আংশিক মর্বিডিটি কল্লোলীয় লেখকদের অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছে। কিন্তু তিনি স্বতন্ত্রভাবে কোনো 'স্কুল'-এর প্রবর্তক নন এবং মানিকের উপর তার প্রভাবও উপেক্ষণীয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের সাহিত্যের সঙ্গে মানিকের আত্মীয়তার সম্পর্কটি আলোচনা-সাপেক্ষ।[৬]

সাহিত্যরচনার প্রথম পর্বে মানিকের উপর যার প্রভাব ছিল অপরিসীম সেই জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) নাম বুদ্ধদেব করেননি। বাস্তবতার বিজ্ঞানসিদ্ধ রূপ সম্ভবত তাঁর অপছন্দ ছিল। সে যাই হোক্—পূর্বোদ্ধৃত অংশটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানিকের মৃত্যুর পরেও তিরিশের যুগের (১৯৩১-৪০) মানিকই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট এবং সমগ্র নিবন্ধটিতে তিনি শুধুমাত্র ঐ দশ-বারো বছরের মানিককে নিয়েই অতি দ্রুত একটি মূল্যায়ন উপস্থিত করেছেন। এ বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলা রচনাটির মধ্যে বিন্যাসগত

পর্থক্য থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গিগত কোনো পার্থক্য নেই। শুধু বয়সের পরিণতিতে পৌঁছে বুদ্ধদেব বসু অনুভব করেছেন যে, 'নিছক বাস্তববাদে, শেষ পর্যন্ত, তৃপ্তি নেই।' 'বাস্তবতার অন্তরালবর্তী কোনো স্বপ্ন বা সত্যের সন্ধান আবশ্যিক। মানিকের 'দিবারাত্রির কাব্য' এদিক থেকেই 'যেন আশ্চর্যের আভাস দেয় থেকে থেকে এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়—'তাদের নিখুঁত বাস্তবসদৃশতা সত্ত্বেও—এই অলৌকিকের উদ্ভাস আমরা অনুভব করতে পারি। (বর্ণিত মানুষেরা যেন অন্য কিছুর প্রতিনিধি এই অনুভবের ফলে তারা নতুন একটা আয়তন পায়—যেটা তথ্যগত নয়, ভাগবত)।'

কিন্তু এরপর মানিক, বুদ্ধদেবের বিচারে, সেই বিশিষ্ট 'ভাবায়তন' হারিয়ে ফেলে শুধু কঠোর মর্মভেদী তীক্ষ্ণ বাস্তবতার মধ্যে অনুলিপ্ত হয়ে যান—দখল করেন এক 'চতুষ্কোণ-প্রদেশ' যা 'দিগন্তহীন' অর্থাৎ যার মধ্যে 'আশ্চর্যের আভাস' কিংবা 'অলৌকিকের উদ্ভাস' নেই—যা কিনা শুধুই বস্তুবিদ্ধ, তথ্যানুগ। বুদ্ধদেব লিখছেন—"মানুষের বিশ্বাসে ঘন ও তপ্ত সেই দেশ, উদ্ভাবনে উর্বর, জীবন সংগ্রামে আরক্তিম—সেখানে চোর, ভিখিরি, কুষ্ঠরোগী, কেরানি এবং কেরানির বৌ জীবন ও প্রজননের সূত্রে অবিরাম ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই প্রদেশের বাস্তবতা অনস্বীকার্য এবং বাস্তবতাই এর প্রধান গুণ। অর্থাৎ এর মধ্যে অস্বভাবী মানুষ বা ঘটনার অভাব নেই। হত্যা, আত্মহত্যা, স্নায়বিক বিকার, মানসিক ব্যাধি, লোভ এবং ক্ষুধাজনিত মত্ততা, এইসব ঘুরে ফিরে দেখা দেয়, এমন কি অপ্রাকৃতও যে কখনো স্থান পায় না তা নয়, কিন্তু এই উপাদানসমূহ কোনো অন্তরালবর্তী অর্থের দ্বারা রঞ্জিত হয় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পটভূমিকাতেই যথাযোগ্য বিন্যাস পায়।" অতঃপর এই বিশ্লেষণ থেকে বুদ্ধদেব বসুর এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয় যে, মানিকের "পূর্ব রচনা কবিতার গুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখান থেকে প্রথম বাস্তববাদে, তারপর প্রকৃতিবাদে তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা।" এবং এসব কিছুর সূত্রেই মানিক কল্লোলের সর্বশেষ, বিলম্বিত, পরিপক্ক ফল হয়ে দেখা দেন।

মানিকের মার্কসবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়াকে এখানেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁর রাজনীতি নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। মানিক তাঁর কাছে শুধু মধ্য বিশশতকের বাংলাদেশের 'সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার' অথবা 'বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয়' এবং বাস্তবের যান্ত্রিক অনুসরণকারী প্রকৃতিবাদী সাহিত্যিকের মতই "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেননি—তাঁর জগতে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে 'ধনী-নির্ধন', 'উচ্চ-নীচ', 'সুস্থ-রুগ্ন' প্রভৃতি সমাজস্বীকৃত বিপরীতগুলো কোনো ভাগবত আদর্শের চাপে ভেঙ্গে পড়ে।"[৭]

মানিকের এমন অভিনব মূল্যায়ন বাংলা-সাহিত্যে আর কেউ কখনো করেননি।

কিন্তু মানিক নিজে কি ভেবেছেন কল্লোল-কালিকলম সম্পর্কে? কতটুকু আগ্রহ ছিল তাঁর কল্লোলীয় সাহিত্যে?

'সাহিত্য করার আগে' নিবন্ধে (দ্রঃ 'লেখকের কথা') মানিকের উক্তি—"ছাত্রবয়সে

আমি যখন লেখা শুরু করি তার কয়েকবছর আগে কল্লোল যুগ আরম্ভ হয়েছে।... খুব শোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ'র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।"

বোঝা যায় কল্লোলের শোরগোল-তোলা সাহিত্য মানিকের অপঠিত ছিল না। কল্লোলগোষ্ঠীর প্রিয় লেখক নুট হামসুনের 'হাঙ্গার' তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। কল্লোলের পৃষ্ঠায় অচিন্ত্যকুমার হামসুনের Pan উপন্যাসের ধারবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন 'মীনকেতন' নামে—মানিক তাও পড়ে থাকতে পারেন। কিন্তু এই অংশে মানিক 'আধুনিক' শব্দটিকে নিজেই উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে স্থাপন করেছেন—আপাতত এটুকু লক্ষ্য করার মতো।

এরপর নিজের লেখালেখি ও কল্লোল প্রসঙ্গে কিছু সংবাদ পাওয়া যায় ২.৮.৫২ তারিখে লেখা মানিকের একটি চিঠিতে—'অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পড়বার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি—বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করেছিলাম যে সাহিত্যজগতে বড়রকমের একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। এ রকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অঙ্ককারে সময় নষ্ট করা যায় না। তখন কল্লোলযুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্য যে মোড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণ মাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে—সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।" (যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

উপরের উদ্ধৃতি দুটি একত্রে পাঠ করলে বোঝা যায়, কল্লোলযুগের সমারোহে বাংলাসাহিত্যে একটা বড়রকমের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে—এ বিষয়ে মানিক নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু যথার্থ বাস্তবতা বা যথার্থ 'আধুনিক' বলতে যা বোঝায় তার আংশিক লক্ষণ কল্লোলে থাকলেও, মানিকের বিচারে তার চরিত্র স্বতন্ত্র, তাই তিনি বলেন—'পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে' এবং সেই রূপের দ্বারাই 'সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে'। 'লেখকের কথা'-র অন্তর্গত পূর্বোক্ত 'সাহিত্য করার আগে' নিবন্ধে এ বিষয়ে মানিকের আরো স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়—

"বাংলাসাহিত্যে কল্লোল কালি-কলমীয় ধারা অর্থাৎ যাকে বলা হতো 'আধুনিক সাহিত্য' এবং যাকে আধুনিক সাহিত্যিকেরা 'বস্তুপন্থী' বলে দাবি করতেন—এই ধারাকে আমি কি ভাবে গ্রহণ করেছিলাম এটাই প্রধান কথা।

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র এবং যেমন আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান পড়তাম তেমনি আগ্রহ নিয়েই আরম্ভ করেছিলাম যৌনবিজ্ঞান, আর বিশ্বসাহিত্য পড়া।

সাহিত্যে ওই 'আধুনিক মার্কা' ধারাটা এসেছিল প্রচণ্ড শোরগোল তুলে, প্রায় একটা বিপ্লব মার্কা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের অন্যান্য

দিক্‌পালেরা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তারুণ্যের এই বল্গাহীন সাহিত্যিক অভিযানে, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না—সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না। জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানে ছিল না।"

বুদ্ধদেব বসু পূর্ব-কথিত বাংলা-নিবন্ধে বলেছেন—"সব ফেনিলতা সত্ত্বেও, কল্লোল পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিলো 'রিয়্যালিজম', তার তরুণগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে আপত্তি করেছিলো—তাঁরা বাস্তববাদী ব'লে নয়, যথেষ্ট বাস্তববাদী ন'ন বলে।' অন্যদিকে মানিক শরৎ-উপন্যাসের (বিশেষত 'চরিত্রহীন' গ্রন্থের) অঙ্গবিস্তর বাস্তবতা-গুণ স্বীকার করলেও—রবীন্দ্রনাথকে রেহাই দিয়েছিলেন কবি বলে—'বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের আবির্ভাবকে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে আজ আমি তাঁকে রেহাই দিই।'[৮] রোমান্স, ইনার রোমান্স, রোমান্টিকতা, ভাবাগের অতিরেক, কাব্যধর্মিতা, অশরীরী প্রেম, আদর্শায়িত চরিত্র-কল্পনা ইত্যাদি বর্জিত এবং বিজ্ঞানবুদ্ধিচালিত যে বাস্তবতার আদর্শ মানিকের মনে সাহিত্য সৃষ্টির কালে শিকড় বিস্তার করেছিল তিনি তারই আলোকে কল্লোল-পূর্ব, কল্লোল-সমকালীন এবং কল্লোলীয় সাহিত্যকে বিচার করেছেন। এ বিচারপ্রবণতা পরিণত বয়সে নয়, সেই ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর মধ্যে জাগত হয়েছিল স্ফুট-অস্ফুট ভাবে। ছোটবেলা থেকেই যে লেখক 'কেন' নামক 'মানসিক রোগে' ভোগেন এবং ছোটবড় সব বিষয়ের 'মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ' অনুভব করেন এবং একই সঙ্গে 'বিজ্ঞানের প্রেমে হাবুডুবু' খেতে থাকেন—তাঁর বিচারশীল মনের আয়তন ও চরিত্র তো কিছু অন্যরকম হবেই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'কালিকলম' তিনজনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়—শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও মুরলীধর বসু। এক বছর পর প্রেমেন্দ্র, দু'বছরের মাথায় শৈলজানন্দ দায়িত্ব ত্যাগ করলে মুরলীধর একাই আরো বছর তিনেক পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। [দ্রঃ কল্লোল যুগ, চতুর্থ সঃ, পৃ. ১৩১]

২. এ সম্পর্কে মানিকও লিখেছেন, 'বিচিত্রা আপিসে গিয়ে গল্পটা দিয়ে এলাম। কার হাতে জানেন? বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমারের হাতে। তিনি তখন বিচিত্রায় ছিলেন। আমি অবশ্য তখন চিনতেও পারিনি—পরিচয় হয় পরে। ['গল্প লেখার গল্প', লেখকের কথা]

৩. অশ্লীল সাহিত্যসৃষ্টি ও প্রচারের অভিযোগে পুলিশী-কর্তৃপক্ষ প্রথম কালিকলম পত্রিকার অফিস সার্চ করার জন্য ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হয়। মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ পুলিশ-কোর্টে অভিযুক্ত হ'ন। কালিকলমে প্রকাশিত সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা' উপন্যাস ও নিরুপম গুপ্ত (মহেন্দ্র রায়) লিখিত 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' গল্প তাৎক্ষণিক

ভাবে অভিযুক্ত হলেও—আসল লক্ষ্য ছিল পত্রিকাটির অন্যান্য যৌনবিনায়ক রচনা। [দ্রঃ কল্লোল যুগ, পৃ. ১৬০-৬৫] কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের চারটি উপন্যাস নিষিদ্ধ হয়েছিল বলে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন—'Four novels by three different authors were put under bar', [দ্রঃ An Acre of Green Grass.p.83] ড. সুকুমার সেন লিখেছেন —'অচিন্ত্যকুমারের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' (১৩৩১) ও 'প্রাচীর ও প্রান্তর' (১৯৩৩) উপন্যাস দুইটি এবং বুদ্ধদেবের গল্পের বই 'এরা ওরা এবং আরও অনেকে' (১৯৩২) অশ্লীলতার ইঙ্গিতবহ বলিয়া বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল (১৯৩৩)।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড পৃ. ৩৪৪]

৪. ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। জুলাই মাসে তার শাখা হিসাবে গঠিত হয় বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'। এই বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'প্রগতি' নামক ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাহিত্য-সংকলনে মানিকের গল্প ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতা স্থান পেয়েছিল। ১৯৩৮ সালে ডিসেম্বরে কলকাতায় 'নিখল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র দ্বিতীয় সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সম্মেলনে পঠিত তাঁর ভাষণটি যথেষ্ট বিতর্কের খোরাক যোগায়। ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র পক্ষে বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধ 'ফ্যাসিজম ও সভ্যতা'। এই সংগঠনের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (১৯৪৫)। সোমেন চন্দের মৃত্যুতে লিখিত তাঁর কবিতার নাম 'প্রতিবাদ'—প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রাচীর' পত্রিকায়। এক অসাধারণ উজ্জ্বল-তীক্ষ্ণ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কবিতা। [দ্রঃ বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা প্রকাশিত সংকলন, ১৯৭৫]

৫. ১৯৪৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখের এক চিঠিতে তিনি সুকান্তকে লিখেছিলেন—

'খবুরে কাগুজে পদ্য লিখে শক্তির অপব্যয় করছ। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।' সুকান্তর মৃত্যুর পর আষাঢ় সংখ্যা 'কবিতা'য় (১৩৫৪) একটি শোক প্রবন্ধে বলেছেন—রাজনীতি করার জন্যই সুকান্ত কবি হতে পারল না। তাঁর বিচারে—'সৈনিক পঙ্‌ক্তিতে বন্দী হলে, কোনো মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, কবিত্ব শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ কি ভাবে অবরুদ্ধ হয়—তারই উদাহরণ সুকান্ত।'

শুধু রাজনীতি নয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আমি কবি যত ইতরের' মত নিরীহ ঘোষণাও তাঁর ভাল লাগত না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতি ও প্রেমেন্দ্রর কবিতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত—'Premendra once permitted himself to declare that he was a poet of the 'coolie and the lowly'; and Subhas burst upon us with the avowal that he had cast his lot with 'workers and peasants'. This has been unfortuate, for this has imposed official robes on these two, robes differing slightly in colour, but equally eclipsing', [Modern Bengali Poetry,

An Acre of Green Grass, P. 59]

৬. এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে তা সাধ্যমত আলোচিত হবে।

৭. এই সূত্রে বুদ্ধদেব বসু মানিকের 'বিবেক' নামক গল্পটির কথা বলেছেন (১৯৪৩-এ প্রকাশিত 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত) যেখানে এক কর্মহীন দরিদ্র নায়ক অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বড়লোক-বন্ধুর সোনার ঘড়ি চুরি করে কিছুটা ভয়ে, কিছুটা বিবেকের দংশনে চুপি চুপি তা ফেরৎ দিয়ে এসেছে কিন্তু তারই মত অপর দরিদ্র বন্ধুর অর্থ চুরি করে নিঃশব্দে তা হজম করেছে। এ-ক্ষেত্রে তার বিবেক বা মানবিক-বোধ জাগ্রত হয়নি। বলাবাহুল্য এটি মানিকের প্রাক্ কমিউনিস্ট পর্বের গল্প এবং অতিনাটকীয়তার লক্ষণাক্রান্ত দুর্বল রচনা। সমস্ত গল্পের মধ্যেই সূক্ষ্ম রোমান্সের চোরাস্রোত বহমান।

৮. দ্রঃ 'সাহিত্য করার আগে', লেখকের কথা।

"চরিত্রহীন' সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উক্তি—"চরিত্রহীন আমাকে অভিভূত বিচলিত করেছিল। বোধহয় আটদশবার বইখানা পড়েছিলাম তন্ন তন্ন করে। বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোঁড়ামি যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে।"

(পরিচয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ বর্ষ পূর্তি সংখ্যা (৫৮ বর্ষ, এপ্রিল-জুন ১৯৮৯) থেকে পুনর্মুদ্রিত।)